ডেনিশ কাগজে প্রকাশিত ব্যাঙ্গচিত্র

মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের ভঙ্গুরতা নাকি ইউরোপের আত্মম্ভরিতা?

মাসুদা ভাট্টি

ডেনমার্কের পত্রিকা জিল্যান্ড-পোস্টেন এ প্রকাশিত ব্যাঙ্কচিত্র গত প্রায় সপ্তাহখানেক ধরে গোটা বিশ্বকে যেনো হেস্তনেস্ত করে ছেড়েছে। একটি কার্টুনই যদি এরকম ভয়াবহ অবস্থার জন্ম দিতে পারে তাহলে একটি প্রবন্ধ কিংবা গ্রন্থ হয়তো নতুন কোনও বিশ্বযুদ্ধই বাঁধিয়ে দেবে, সন্দেহ নেই। এই হেস্তনেস্ত কাণ্ড যদিও মাত্র কয়েক সপ্তাহ ধরে ঘটছে কিন্তু ঘটনাটির জন্ম ২০০৫ সালের অক্টোবর মাসে। একজন ডেনিশ লেখক হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর ওপর একটি গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সে দেশের নামকরা চিত্রকরদের কাছে আবেদন জানান যাতে তারা বইটির ইলাস্ট্রেশন করে দেন। কিন্তু কেউই তাতে রাজি হননি, সকলেই একবাক্যে লেখককে জানিয়েছেন যে, এরকম কোনও ছবি আঁকলে তাদের প্রাণসংহার হতে পারে এবং তারা তা করবেন না। ডেনিস রাইটার্স ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট চিত্রকরদের এই ভীতিকে ফ্রিডম অব স্পিচ বা বাক্ স্বাধীনতার ওপর হুমকি বলে বর্ণনা করেন জিল্যান্ড-পোস্টেন এ দেওয়া এক সাক্ষাতকারে। কিন্তু এরপর ডেনমার্কের চলিস্নশজন চিত্রকরের কাছ থেকে সাড়া পাওয়া যায় এবং তারা পরীক্ষামূলক ভাবে মোট বারোটি ব্যাঙ্গচিত্র এঁকে পাঠান। বর্তমান পৃথিবীতে ক্রমবর্ধমান ইসলামিক জঙ্গি জিহাদিদের মনোভাবের পরিচয়টিই এসব ব্যাঙ্গচিত্রে তুলে ধরা হয়েছে বলে চিত্রকররা দাবি করেন। লেখকের বই প্রকাশ এবং তার ইলাস্ট্রেশন সম্স্লর্কিত সমুদয় ঘটনার বর্ণনা করে যে নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় তার সঙ্গেই একটি ব্যাঙ্গচিত্র জুড়ে দেওয়া হয়েছিল।

জিল্যান্ড-পোস্টেন এ একটি কার্টুন প্রকাশিত হওয়ার পর ডেনমার্কের সবচেয়ে বড় মসজিদের ইমাম তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ''মুসলমানদের জন্য এ ধরনের গণতন্ত্র প্রয়োজনহীন। ইসলামে গণতন্ত্রের কোনও ভূমিকা নেই। মুসলমানদের ওপর এ ধরনের আঘাত মেনে নেওয়া হবে না। এ জন্য ক্ষমা চাইতে হবে।'' কিন্তু পত্রিকাটির সম্স্লাদক এই প্রতিক্রিয়ার জবাবে বলেন, ''আমরা গণতান্ত্রিক বিশ্বে বসবাস করি। সাংবাদিকতার সকল নিয়ম মেনে সবকিছু প্রকাশের অধিকার এখানে স্বীকৃত। স্যাটায়ার এই দেশে বৈধ এবং সকলেরই ব্যাঙ্গচিত্র এখানে নিষিদ্ধ নয়। স্বাধীন মতপ্রকাশে ধর্ম কোনও প্রকার বাঁধার সৃষ্টি করতে পারে না। কোনও মুসলমানকে অপমান করার উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করা হয়নি। ধর্মনিরপেক্ষ সমাজে সকল ধর্মই সমান ভাবে গৃহীত এবং গণতন্ত্রে প্রত্যেককে এমনকি দেশের সর্বোচ্চ ব্যক্তিকেও কখনও না কখনও সমালোচনার মুখোমুখি হতে হয় এবং সেটা মেনে নেওয়াটাই গণতান্ত্রিক চরিত্রের পরিচায়ক''।

গত অক্টোবরে এই ঘটনা ঘটলেও ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ এই বিবাদ শুধুমাত্র ডেনমার্কেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু হঠাৎ করে মধ্য জানুয়ারীতে বিষয়টি মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় এবং তা দ্রম্নত ছড়িয়ে পড়ে সবার মধ্যে। বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের উগ্রপন্থী ধর্মীয় সংগঠনগুলি ঘটনাটিকে দ্রম্নত রাজনৈতিক রূপ দেয় এবং এসব দেশের সরকারকে বাধ্য করে বিষয়টি নিয়ে ডেনমার্ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করতে। ডেনমার্কে নিযুক্ত মধ্যপ্রাচ্যের এগারোটি দেশের রাষ্ট্রদূতগণ ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রী আন্দ্রে ফগ রাসমুসেনের কাছে এক আবেদনে এই পত্রিকাটির প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন এবং তার সঙ্গে দেখা করতে চান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী এক বিবৃতিতে বলেন যে, ''এটা গণতান্ত্রিক নীতির ব্যাপার। এই বিষয়টি নিয়ে আমি তাদের সঙ্গে দেখা করতে পারি না। আমি ধর্মীয় দৃষ্টি দিয়ে কখনওই বাক স্বাধীনতাকে দেখতে পারবো না। ডেনিশ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনও কাজই আমার পক্ষে

করা সম্ভব নয়। একজন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মিডিয়ার ওপর হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার আমাকে দেওয়া হয়নি এবং আমি সে রকম কোনও অধিকার দাবীও করি না''।

এরমাঝে ডেনমার্ক সহ ইউরোপের অন্যান্য দেশ এবং মধ্যপ্রাচ্যে প্রকাশিত এই ব্যাঙ্গচিত্রের বিরুদ্ধে অব্যাহত বিক্ষোভ বিদ্বেষে রূপ নেয়। এবং শুরু হয় জ্বালাও-পোড়াও নীতির প্রয়োগ। পাকিস্তানের জামায়াত-ই-ইসলামী এই ব্যাঙ্গচিত্র যারা এঁকেছে তাদের হত্যা করার জন্য পাঁচ হাজার ক্রোনার পুরষ্কার ঘোষণা করে। এরই মধ্যে কাশ্মীরে এই ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে দু'দিন হরতালও পালিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো, মিশরের আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় যা এতোদিন যাবত মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে উদার ও সৃষ্টিশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত ছিল সেখানকার গ্রান্ড শেইখ মোহাম্মদ সাঈদ তান্তাভি এই ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশকে বিশ্বের এক বিলিয়ন মুসলমানকে অপমান বলে অভিহিত করে জাতিসংঘের কাছে এর বিচার দাবি করেছেন। ইতোমধ্যে সউদি আরব, লিবিয়া, সিরিয়া ডেনমার্ক থেকে তাদের রাষ্ট্রদুতদের নিজের দেশে ফিরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এরই মধ্যে ডেনমার্কের জিল্যান্ড-পোস্টেন পত্রিকাটি এই মর্মে বিবৃতি দিয়েছে যে, তাদের প্রকাশিত ব্যাঙ্গচিত্র যদি কারো মনে কষ্ট দিয়ে থাকে তবে তারা আন্তরিক ভাবে দুঃখিত, এদিকে ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশের পত্রিকায় প্রকাশিত এই ব্যাঙ্গচিত্রের কারণে একজন ফরাসি সম্পাদককে পদত্যাগও করতে হয়েছে। কিন্তু এগারোটি মুসলিম দেশের দাবি হচ্ছে, ডেনিশ সরকারকে এ জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। লক্ষ্যনীয় যে, এগারোটি মুসলিম দেশের মধ্যে যে তিনটি দেশ ডেনমার্ক থেকে রাষ্ট্রদুত প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে তাদের প্রত্যেকটিই এই এগারোটি দেশের মধ্যে তুলমানুলক ভাবে ধনী।

কিন্তু ডেনিশ সরকারের বক্তব্য হচ্ছে একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিষয়ের জন্য সে দেশের সরকার কেন ক্ষমা প্রার্থনা করবে? যেখানে সেই দেশটিতে বাক্ স্বাধীনতা ও মানবাধিকারের উজ্জ্বল চর্চা ও দৃষ্টান্ত রয়েছে সেখানে যদি দেশটির সরকার এখন কোনও স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে সে দেশের প্রচলিত আইনেই পরিবর্তন আনতে হবে, অন্যথায় এটা সম্ভব নয়। তারা আরও বলতে চাইছে যে, এই ফ্রিডম অব স্পিচ বা বাক স্বাধীনতার জন্য ইউরোপকে কম রক্ত দিতে হয়নি, দীর্ঘ প্রায় দু'শ বছরের সংগ্রামের ফলে যে বাক্ স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে তা যদি একবিংশ শতাব্দীতে এসে বিসর্জন দিতে হয় তবে সেটা হবে সভ্যতার দুঃখজনক পরিণতি।

প্রকাশিত এই ব্যাঙ্গচিত্র নিয়ে যে সংঘর্ষ এখন চলছে তার তাত্ত্বিক বাদানুবাদগুলি লক্ষনীয়। বিশেষ করে ইউরোপেই এখন বাক্ স্বাধীনতার দৌঁড় নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অর্থাৎ বাক্ স্বাধীনতা যদি কোনও বিশেষ গোষ্ঠী বা ধর্ম বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ায় অথবা তার ফলে যদি সংঘর্ষ শুরু হয় যা মানব সভ্যতাকেই প্রকারান্তরে ধ্বংসের মুখোমুখি করে তোলে তাহলে তাকে কী বাক্ স্বাধীনতা বলা যাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রিটেনের সংবাদপত্রগুলির অবস্থান ইতিবাচক, তারা ইউরোপের অন্যান্য দেশের সংবাদপত্রগুলির মতো এই ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশ না করে বরং সংযমের পরিচয় দিয়েছে। বিখ্যাত গার্ডিয়ান পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে স্পষ্ট ভাষাতেই লেখা হয়েছে যে, গার্ডিয়ান ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেও একথা দৃঢ়ভাবে মনে করে করে যে, কাউকে কষ্ট দেওয়ার জন্য এই বিশ্বাসের ব্যবহার সঠিক পথ নয়। এরকম অনেকেই মনে করছেন।

কিন্তু অপরদিকে এ কথাও বেশ জোরালো ভাবেই আলোচনায় আসছে যে, কাউকে নিয়ে ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশের অর্থ এই নয় যে, একটি বিশেষ গোষ্ঠী কিংবা ধর্মবিশ্বাসীদের ওপর ঢালাও ভাবে সেই ব্যাঙ্গ আরোপ করা। এমনকি যে গার্ডিয়ান পত্রিকা ব্যাঙ্গচিত্র প্রকাশের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব প্রকাশ করেছে সেই পত্রিকাটিই

লন্ডনে মুসলিম বিক্ষোভকারীদের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে বলেছে, ইসলাম শান্তির ধর্ম বলে দাবী করা সত্ত্বেও কেন একটি মাত্র ব্যাঙ্গচিত্রের জন্য এতো বিক্ষোভ, এতো হুমকি। ইউরোপকে মানচিত্র থেকে উড়িয়ে দেওয়া হবে, ৭ জুলাইয়ের মতো বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে লন্ডন ধ্বংস করা হবে, আল-কায়েদা ছাড়া মুসলমানদের উদ্ধার নেই কিংবা ইউরোপকে অবিলম্বে ইউরোস্তান-এ পরিণত করা হবে– এসব মন্তব্য নিয়ে লন্ডনের রাস্তায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের অর্থই হচ্ছে নিজেদের জঙ্গি সন্ত্রাসী হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এর ফলে ব্রিটেন কিংবা ইউরোপে গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষ যারা মুলতঃ মুসলিম নয়, তাদের সামনে নিজেদের অবস্থানকে নাজুক করে তোলা। এমনিতেই ইউরোপে বর্ধিষ্ণু উগ্রবাদ এখানে যে ভবিষ্যৎ সংকটের আভাস দিচ্ছে তা এই বিক্ষোভ আরও উস্কে দেবে। ইউরোপে মোট ১৫ মিলিয়ন মুসলমানের বসবাস এখন। এরা যদি অবিলম্বে ইউরোপিয় উদারতা, যা এখানকার অন্য ধর্মাবলম্বীরা মেনে নিয়েছে (বাধ্য হয়েই হোক কিংবা গণতন্ত্রের আপাতঃ মুখোশের কারণেই হোক) তার অনুসরণ চেহারা ও চরিত্রে না দেখাতে পারে তাহলে সংঘাত তীব্র হতে বাধ্য, এবং তাতে ক্ষতি আর কারো নয়, ইউরোপের এই ১৫ মিলিয়ন মুসলমানেরই। কারণ তারা নিশ্চয়ই আর নিজের দেশে ফিরে যেতে আগ্রহী নন, ইউরোপেই তারা বসবাস করতে চান এবং এখানেই তাদের পরবর্তী বংশধরকে জীবন যাপন করতে হবে। সেক্ষত্রে তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে হলেও ধর্মকে সকল সংশয়-সংকোচ থেকে মুক্ত রাখতে হবে। বিশেষ করে. সামান্য কোনও ব্যাঙ্গচিত্রের ফলে এক বিলিয়ন মানুষের অনুসৃত একটি ধর্মের চুল পরিমাণ কোনও ক্ষতি হতে পারে– এটা ভাবাটাই বোকামি নয় কি?

অপরদিকে এরকম কথাও কেউ বলছেন যে, বিশেষ ধর্মের ওপর ইউরোপের বিদ্বেষ নতুন কিছু নয়। হিটলারের হাতে নিহত ছয় মিলিয়ন ইহুদির শোকাবহ ঘটনা এখনও মাত্র গতকালের ইতিহাস। এখন পনের মিলিয়ন মুসলমান নিয়ে ইউরোপ যদি ভীত হয়ে নতুন কোনও হলোকাস্টের পুনরাবৃত্তি ঘটায়? এরকম ভীতিকে তো আর অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু একথাও তো সত্যি যে, এই ইউরোপেই হিটলারের চরম পরিণতি আমরা দেখেছি, এমনকি তার নাৎসি সহযোগীদের এখনও পর্যন্ত খুঁজে এনে বিচারের সম্মুখীন করা হচ্ছে। সম্প্রতি লন্ডনের একজন এমপি'র অনুরোধে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লন্ডনে পালিয়ে আশ্রয় গ্রহণকারী নাৎসি সহযোগিদের খুঁজে বের করার নতুন নির্দেশ জারি করেছে। সবচেয়ে বড় কথা যে ভয়াবহ রক্তপাতের ভেতর দিয়ে ইওরোপ সভ্যতার আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে সেই ভয়াবহতার সর্বশেষ রূপ ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। নতুন করে সেই ভয়াবহতায় ফিরে যেতে ইউরোপ আগ্রহী হবে বলে বিশ্বাস করা দুষ্কর। ফলে ডেনিশ পত্রিকায় প্রকাশিত ওই ব্যাঙ্গচিত্র সামগ্রিক ভাবে ইসলাম ধর্মের ওপর আঘাত বলে মেনে নেওয়াও অত্যন্ত কষ্টকর।

সবচেয়ে যে বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসছে তাহলো, খ্রীস্টান ধর্ম কিংবা যীশু খ্রিস্টকে নিয়ে যে সব ব্যাঙ্গ চিত্র, প্রবন্ধ-নিবন্ধ কিংবা পুস্তক সারা বছর ধরে ইউরোপ কিংবা অন্যান্য দেশে প্রকাশিত হয় তার সংখ্যা গণনার অতীত। এসব পুস্তক কিংবা চিত্রে যীশু খ্রীস্টকে সমকামী কিংবা ভাঁড় হিসেবে দেখানোও হয়েছে একাধিকবার। এমনকি কুমারী মেরিকে নিয়ে পর্ণোগ্রাফিও প্রকাশিত হয়েছে। ইতোমধ্যেই ইতালীতে যীশু খ্রীস্টের অস্তিত্ব নিয়ে মামলা পর্যন্ত হয়ে গেছে, এই মামলায় বলা হয়েছে যে, চার্চগুলো যীশু খ্রীস্টের কথা বলে মানুষকে ধোকা দিচ্ছে, যীশু খ্রীস্ট বলে আদৌ কেউ নেই। এতে কী খ্রীস্টান ধর্মের কিংবা যীশু খ্রীস্টের প্রতি কারো ব্যক্তিগত বিশ্বাসে কোনও হেরফের হয়েছে? সামান্য কোনও ব্যাঙ্গচিত্র কিংবা সমালোচনায় কারো স্থির বিশ্বাসে যদি চিড় ধরে তাহলে সেই বিশ্বাসের অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন ওঠে, যে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এখন মুসলমানদের সম্পর্কে। প্রশ্ন উঠছে যে, মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাস কি এতোটাই ঠুনকো যে একটি পত্রিকায় প্রকাশিত ব্যাঙ্গচিত্রের কারণে সেই বিশ্বাসে চিড় ধরতে পারে? কোরআনের নির্দেশ অপরিবর্তনীয়, কিন্তু সেটা

তো শুধু ইসলামে বিশ্বাসীদের জন্য, অপর ধর্মাবলম্বীদের তো সেটা নিয়ে কথা বলতে বাঁধা নেই। যেমনটি বাঁধা দেওয়া হয় না কোনও মসজিদে শুক্রবারের খুতবায় যখন ইহুদী ও খ্রীস্টানদের ধ্বংস কামনা করা হয়। কারণ একথাতো কোরআন ও হাদীসে স্পষ্টই উল্লেখ রয়েছে যে, অমুসলিমদের ধ্বংস করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। হজরত মুহম্মদ (সঃ) স্পষ্টতঃই ঘোষণা দিয়েছেন যে, ‘‘জান্নাত তরবারীর ছায়াতলে’’ – অর্থাৎ জিহাদীদের তরবারি যা অমুসলিমদের হত্যা করে, তারা যদি নিহত হয় তবে তাদের জন্য বেহশত্ নিশ্চিত। এমনকি কোরআনে একথাও বলা হয়েছে যে, ‘‘যারা আমাতে (আল্লাহ-কে) বিশ্বাস এনেছো তারা যেনো কোনও ইহুদি ও খ্রীস্টানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না’’। এখন এই প্রশ্নই তীব্রতা পাচ্ছে যে, এই ইহুদি ও খ্রীস্টান কারা? হজরত মুহম্মদ (সঃ)-এর সময়কার নাকি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পৃথিবীর? যদি সেই সময়ের হয় তাহলে কোনও আপত্তি নেই কিন্তু যদি এই সময়ের হয় তাহলে এই বিশ্বায়নের যুগে মুসলমানরা বন্ধুহীন হয়ে পড়বে না কি? সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই বিশ্বাস নিয়ে আধুনিক যুগে মুসলমান বিশেষ করে যারা ইউরোপে বসবাস করছেন তারা অস্তিত্ব বজায় রাখবে কী করে? আর এই বিশ্বাসের কথাতো অমুসলিমদেরও অজানা নয়, সেক্ষেত্রে তারাই বা মুসলমানদের এই বিশ্বাস মেনে নিয়ে তাদের সঙ্গে খোলামনে মিশবে কেমন করে? তাই কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন যে, ধরা যাক ডেনিশ সরকার নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করলো, কিন্তু তারপরেও ওই চিত্রকরদের জীবনের নিরাপত্তা কে দেবে, যখন তাদের হত্যার জন্য পুরষ্কারও ঘোষিত হয়ে গেছে? আর এরপরে অমুসলিম হত্যার জন্য পরকালে বেহেশতের পুরষ্কার তো আছেই।

এরকমই হচ্ছে প্রকাশিত ব্যাঙ্গচিত্র নিয়ে পক্ষে-বিপক্ষে মতামত। আমাদের ভুললে চলবে না যে, এই ইউরোপেই বাক স্বাধীনতা কিংবা চিন্তার স্বাধীনতার জন্য ভলতেয়ার, রঁম্যা রঁল্যা, ভিক্টর হিউগো, চার্লস ডারউইন কিংবা বার্টান্ড রাসেল যে কষ্ট সহ্য করেছেন তার সুফল কেবলমাত্র এখনই মানুষ ভোগ করতে শুরু করেছে। এখন যদি তাতে ব্যাঘাত ঘটে তাহলে সভ্যতাকে পেছাতে হবে ভূতের মতো পেছনে পা লাগিয়ে, কিন্তু সভ্যতার গতিতো পশ্চাৎমুখী হতে পারে না। এমনকি তথাকথিত মুসলিম বিশ্বেও কি মানুষ সভ্যতার ধাবমান গতিকে অগ্রাহ্য করতে পারছে? যদি পারতো তাহলে তো ডেনমার্কের একটি পত্রিকায় কী প্রকাশিত হলো সেটাই তাদের জানার কথা ছিল না, কারণ সভ্যতার ধাবমান গতির বাহক কম্পিউটার তথাকথিত মুসলিম বিশ্বেও পৌঁছে গেছে বলেই না সেখানে এই ব্যাঙ্গচিত্র সম্পর্কে জানার সুযোগ হয়েছে। আরও একটি যৌক্তিক কথা হলো, যেহেতু ব্যাঙ্গচিত্রটি প্রকাশিত হয়েছে একটি পত্রিকার পাতায় সেহেতু এর প্রতিবাদও হওয়া উচিত ছিল কলম-কালি-কাগজের মাধ্যমেই, রাস্তায় কিংবা দুতাবাসে আগুন জ্বালানোর মাধ্যমে নয়। এখানেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, কালি-কলম-কাগজের শক্তি কোনও অংশেই ভাঙচুর কিংবা বোমাবাজির তুলনায় কম নয়– দু'টি পক্ষ যখন একই শক্তিতে লড়ে যাচ্ছে সেহেতু আমাদের এরকমটাই বুঝতে হবে নাকি? আজকে যদি ওই ব্যাঙ্গচিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও কালি-কলম-কাগজে হতো তাহলে মুসলমানদের এই বিক্ষোভ নিয়ে কারোই কিছু বলার থাকতো না, কারণ তাতে ব্যক্তি মানুষের ওপর আঘাত ও রক্তপাতের কোনও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু বিষয়টাতো তা নয়, একপক্ষ লড়ছে কালি-কলম-কাগজ নিয়ে, নিজের লেখার টেবিলে বসে আর অপরপক্ষ তলোয়ার-বন্দুক-আগুন নিয়ে রাস্তায় নেমে এসেছে– এই বাস্তবতাই কি পশ্চিমকে ইরানের পারমাণবিক পরীক্ষা-বিরোধীতায় উস্কে দিচ্ছে না? যদিও এতে সৌদি আরবের উস্কানি আর শিয়া-সুন্নি বিরোধও কম ভূমিকা রাখছে না, কিন্তু সেটা ভিন্ন বিষয়। আগামিতে এই বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত লেখার ইচ্ছে রইলো।

ব্রিটেনের সর্বাধিক প্রচারিত এবং বিনামুল্যে বিতরিত দৈনিক মেট্রোতে প্রকাশিত একটি চিঠির উদ্ধৃতি দিয়ে আজকের নিবন্ধের ইতি টানছি। চিঠিটি লিখেছেন স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহর থেকে জনৈক আলী সাইয়্যেদ। তিনি লিখেছেন, “লেবাননের রাজধানী বৈরুতে যখন ডেনিশ দুতাবাস জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তখন যদি ডেনিশ

রাষ্ট্রদুত সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ঘোষণা দিতেন যে, বিক্ষোভকারীদের মধ্যে যারা যারা ডেনমার্কে স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছুক তাদের এই মুহূর্তেই ডেনিশ পাসপোর্ট দেওয়া হবে। তাহলে আমি নিশ্চিত করেই বলতে পারি যে, সেখানে মাত্র দশজন লোকও হয়তো অবশিষ্ট থাকতো না বিক্ষোভে অংশ নিতে। সত্যিই, এই সত্যকে কিন্তু অবহেলা করা যাবে না। নিজেদেরকে ডেনমার্কের অবস্থানে না তুলে প্রতিবাদী হওয়াটার মধ্যে আর যাই-ই হোক কৃতিত্ব থাকতে পারে না।" আমার নিবন্ধের পাঠকদের বিষয়টি নিয়ে ভাববার অনুরোধ জানাচ্ছি।

লন্ডন ॥ ১৩ ফেব্রুয়ারি, সোমবার ॥ ২০০৬ ॥